***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 125 – 131*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848*

# বেদিয়া জনজাতির জীবনচর্যার ইতিবৃত্ত : প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

সাগারিকা সাহা
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sagarikasaha111@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

## Keyword

Bediya, Tribal culture, History, Tribal society, anthropology.

## Abstract

The present article named 'The biographical history of bediya tribal people : in context of Tarashankar Bandopadhyay's short stories' revolves around one of India's primitive tribal communities called Bediya as depicted in the short stories by Tarashankar Bandopadhyay. Their history and their social life are observed and people document a historical account or a complete profile of the socio- economic as well as cultural life of the bediya people, which possesses vast literary, historical, archaeological, anthropological and social value.

## Discussion

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের দুই প্রধান উপজীব্য বিষয় - রাঢ়ের মানুষ এবং গ্রাম্য পরিবেশ। লেখকের জন্ম এবং বড় হওয়া বীরভূমের লাভপুরের গ্রাম্য পরিবেশে। জমিদার বংশে জন্ম হওয়ায় এবং তিনি সেবাব্রতী হয়ে গ্রামের মানুষদের নানান সহায়তার জন্য পাশে দাঁড়াতে গিয়ে একসময় তিনি গ্রাম্য পরিব্রাজক রূপে পরিচিত হন।রক্তমাংসের অসহায় মানুষদের জীবনকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং গভীর চিত্তে উপলব্ধি করেছিলেন। লেখকের জন্ম যে বীরভূমের মাটিতে, সেই রাঢ়অঞ্চল বা জঙ্গলমহল মূলত আদিবাসী প্রধান, এই রাঢ়ে উপেক্ষিত 'ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন' জনসমাজ - বেদে, সাঁওতাল, হাড়ি, ডোম, বাগদী, জেলে, চামার, লোহার, কামার ইত্যাদিদের বাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যমানস বিশাল ও এই বিচিত্র প্রেক্ষাপটে পরিপুষ্ট। আধুনিক সভ্যসমাজ থেকে তথাকথিত ভাবে অনগ্রসর গ্রাম্য মানুষদের জীবনের রূপরেখাচিত্র তারাশঙ্করের সাহিত্যে স্থান পেয়েছে একান্ত নিবিড়ভাবে।

উনিশ-বিশ শতকে আদিবাসী সম্পর্কে সাধারণত মানুষদের ধারণা অন্য রকম। আদিবাসী এবং হিন্দুধর্মের নিম্নবর্গের মানুষদের মাধ্যে যে জাতিগত পার্থক্য আছে এবং তাদের ধর্মীয়, সংস্কৃতিক আচার - আচরণের যে অনেকখানি

পার্থক্য আছে তা বর্তমানেও অনেকের কাছে অজানা। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুব একটা বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও ভাষা, ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতির পার্থক্য বিদ্যমান, যা একটা জাতির পরিচয় নির্মাণের ভিত্তি। নিম্নবর্গীয়দের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখা থাকলেও তৎকালীন রবীন্দ্রযুগে সময়ে আদিবাসীদের নিয়ে সেরূপ সাহিত্য চর্চা হয়নি। প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদে আদিবাসীদের কথা পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে মঙ্গলকাব্য এবং পরবর্তী সময়ে আদিবাসীকেন্দ্রিক বাংলাসাহিত্য সেভাবে পাওয়া যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'বাঙালির উৎপত্তি' প্রবন্ধে আদিবাসী সম্পর্কিত ধারণা এবং নানান তথ্য পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যেও খুবই সামান্য মাত্র আদিবাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়,যা আদিবাসী জীবনের সামগ্রিক চিত্র বলা যেতে পারেনা। রবীন্দ্রসমসাময়িক যুগে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় আদিবাসীরা অপাঙক্তেয় হয়েই থেকে যায়। তবে তিরিশের দশকে কল্লোলযুগে শৈলজানান্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলাসাহিত্যে আদিবাসী জনজীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র লিপিবদ্ধ হয়। এছাড়াও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' (বঙ্গদর্শন ১২৮৭-১২৮৯) ভ্রমণকাহিনীতে, সুবোধ ঘোষের লেখায় আদিবাসী মানুষের কথা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখায় নিম্নবর্গীয় মানুষেরা স্থান পেলেও আদিবাসীদের জনজীবনের কথা সেভাবে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে শৈলজানন্দ-বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্করের কলমে বাংলাসাহিত্যে উঠে এসেছে আদিবাসী জনজীবনের নানান অজানা তথ্য।

তিরিশের দশকে শৈলজানন্দের কলমে প্রথম আদিবাসী মানুষ, কয়লাকুঠির কথা উঠে এলেও তারাশঙ্করের আগে বেদিয়া জনজাতি নিয়ে লেখালেখি হয়নি। তারাশঙ্করের ছোটগল্পেই প্রথম বেদিয়াদের নিয়ে এত তথ্যভিত্তিক বিষয় লেখা হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদেনি', 'বেদের মেয়ে', 'সাপুড়ের গল্প', 'যাদুকরের মৃত্যু', 'নারী ও নাগিনী', 'বরমলাগের মাঠ', — উল্লেখিত গল্পগুলো বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বেদিয়া জনজাতির যে পূর্ণাঙ্গ জীবনচর্চার চিত্র বা তথ্য ফুটে ওঠে সেই বিষয়টি এই প্রবন্ধে আলোচ্য। বেদিয়া জনজাতির যে চিত্র তারাশঙ্করের গল্পে পাই, সেই আলোচনার পূর্বে এই বেদিয়া জনজাতি সম্পর্কিত কিছু তাত্ত্বিক তথ্য আলোচনা প্রয়োজন। বেদিয়া গোষ্ঠী ইন্দো - আর্য ভাষা গোষ্ঠীর শাখা। ১৯৮১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী বেদিয়াদের জনসংখ্যা - ২৯, ৩৯৬ পশ্চিমবঙ্গে। বেদিয়াদের ভাষা 'সাদরি' ভাষা। বেদিয়া জনজাতির বাস পুরুলিয়া, নদীয়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর এছাড়াও বাংলাদেশেও এদের বাস আছে।

বেদিয়াজনগোষ্ঠীদের রিজলি সাহেব মনে করতেন তারা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীরই এক শাখা। ডালটনসাহেব বেদিয়াদের বাজিকর/বাজিগর অথবা নাটসম্প্রদায় ভুক্ত বলেছেন। তবে বেদিয়ার মূলত নিজেদের 'মাঝি' বা 'মহালী' বলে পরিচয় দেয়। এরা স্বভাবে এবং অভাবে যাযাবর শ্রেণীর। বেদিয়া জনজাতির মধ্যে আছে শিক্ষার অভাব এবং এরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীষন ভাবে। বেদিয়া জনজাতির সাতটি উপশ্রেণী আছে - ১) বাবাজিয়া, ২) বাজীগর/বাজিকর, ৩) মাল, ৪) সাঁপোড়ীয়া, ৫) মীরশিকার, ৬) আনদার ৭) বেদিয়া। এই শ্রেণীবিভাগ পেশাভিত্তিক। বেদিয়া জনজাতির অনেকেই যাদুবিদ্যা আয়ত্ত করে। তবে আগের থেকে বর্তমানে একটু হলেও এই রূপরেখার বদল ঘটেছে। বর্তমানে বেদিয়া সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ যাযাবর থেকে স্থায়ী হয়েছেন এবং কৃষিকাজকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক হলেও শিক্ষার আলো প্রবেশ করছে।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত অলোচনায় বেদিয়া জনজাতির নৃতাত্ত্বিক (anthropology) কিছু তথ্য সম্পর্কিত কথাই বলা হয়েছে। একটি জাতির সভ্যতা - সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, প্রান স্বন্তন্ত্রতা সেই জাতির ভাবপুঞ্জে বিদ্যমান। এই ভাবপুঞ্জ সেই জাতির ইতিহাসের আধারেই পর্যবসিত। জাতির সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতির বিকাশের কথা তার অতীতে, ইতিহাসে নিহিত। বেদিয়া জনজাতির জীবনচর্যার ইতিহাসের যে রূপরেখাচিত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে উদ্ভাসিত সেই বিষয়টি নিম্নে আলোচনা করা হল।

তারাশঙ্করের গল্পেই প্রথম সভ্য-আধুনিক সমাজের চোখে যারা 'ব্রাত্য', 'অস্পৃশ্য', 'নিচুজাত', সেই বেদিয়া জনজাতির জীবনচিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ উদ্ভাসিত। বেদিয়া আদিবাসী নারীদের নিয়ে রোম্যান্টিসিজম, কামুক ভাবনা অনেক লেখাতে এলেও, তাদের খাদ্য - বস্ত্র - অলংকার, জীবিকা, দাম্পত্য- প্রেম, পোশাক - অলংকার, সংস্কার - সংস্কৃতি,

রীতি-নীতি, ধর্ম, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থান এই সামগ্রিক রূপ - উল্লেখিত গল্পগুলি সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ। গল্পের মাধ্যমে লেখক বেদিয়াজনজাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন বলা যেতে পারে, যার মূল্য অপরিসীম। এমন এক জনজাতি, যাদের নিয়ে না খুব বেশি তথ্য আছে, না সেক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য। এমনকি বিভিন্ন গবেষনার ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের এই বেদিয়া জাতির তথ্যকেন্দ্রিক গল্পগুলি গুরুত্ব অমূল্য। সাহিত্য সমাজের দলিল একথা তারাশঙ্করের গল্প গুলির ক্ষেত্রে ভীষণভাবে সত্য।

লেখক বেদে মেয়ের আঞ্চলিক সংলাপ, লোকবিশ্বাস, সংস্কার, ট্যাবু- নিষেধ, মিথ অথবা লোক - প্রকরণ এর সাহায্য নিয়ে অন্ত্যজ লোক সমাজের স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। বেদিয়া সমাজের ও জীবনদর্শনের চিত্রাঙ্কনে তারাশঙ্কর যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে অনাবিষ্কৃত ছিল। গল্পের আকারে যেন তথ্য চিত্র, জাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ। বেদিয়া জাতির পরিচয় উন্মোচনে তারাশঙ্করের গল্পগুলো বিশেষ মৌলিকতার দাবি রাখে। বেদেনিদের লালসা - কামনার উত্তাল জোয়ারে, তাদের আদিম জীবন স্রোত প্রবাহিত করে লেখক ব্যাঞ্জনাকে স্পষ্ট করে। লোক সাহিত্য ও বাস্তবিকতার রসে পুষ্ট তারাশঙ্করের সাহিত্য। তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন - বর্বর, অর্ধসভ্য ও সভ্য বেদের তিন চারটি দল প্রতি বছর তাদের অঞ্চলে আসত। ১৩২৩/২৪ এ তিনি সাপুড়ে, বেদেনিদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের সঙ্গে হৃদ্যতাও হয়। তারাশঙ্করের গ্রামীন সমাজ শিক্ষা। রাঢ় অঞ্চলের বিচিত্র জীবন-ধারার সমগ্র আদিবাসী সমাজ তাদের নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি-লোকাচার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তারাশঙ্করের গল্পে।

শনিবারের চিঠিতে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদেনি' গল্পটি প্রকাশিত। গল্পটি এক বেদে নারীর জীবন পিপাসার গল্প। এক স্বেচ্ছাচারী নারীর যাযাবর জীবনযাপন কামনার গল্প। রূপ লাবণ্যে ভরপুর বেদিনী নারী রাধিকার মত্ত আদিমতার পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে তার একের পর এক পুরুষ সঙ্গী বদলের মধ্যে। সে তার যাযাবরী আদিম জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে এক পুরুষ থেকে অন্য নতুন পুরুষকে জীবনসঙ্গী করেছে। বেদিয়া নারীদের সাহস-স্বেচ্ছাচারিতার রূপ প্রকাশ করেছেন লেখক রাধিকা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। গল্পটিতে বেদিয়া জনজাতি যে যাযাবর এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের স্পষ্টরূপ প্রতীয়মান। এছাড়াও গল্পে বেদিয়াদের জাতিগত রূপ বৈশিষ্ট্য লেখক তুলে ধরেছেন -

> "কালো সাপিনীর মত ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গীনি বেদিনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদাসূতার মত সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্ধ নিমালিত ভঙ্গির মদির দৃষ্টি দুটি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে - সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন তার যেন মদিরার দৃষ্টি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে সদ্য স্নান করিয়া উঠিল। মাদকতা তার সর্বাঙ্গ বহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়ে দেয় মাদকতা বেদিনীর কালো রূপও চোখে তেমনই একটা ধরাইয়া দেয় নেশা। শুধু রাধিকাই নয়, এই বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত রূপ বৈশিষ্ট্য।"[১]

এছাড়াও গল্পে বেদিয়া সম্প্রদায়কে তারাশঙ্কর 'বাজিকর' হিসেবে উল্লেখ করেছেন - শম্ভু বাজিকর, নূতন বাজিকর। ডালটন সাহেবও বেদিয়াদের বাজিকর সম্প্রদায়ভুক্ত বলেছেন। এদের জীবিকা নির্বাহ হয় যাযাবর জীবন যাপনের মাধ্যমে এবং ভোজবাজি বা সার্কাসে খেলা দেখিয়ে। এছাড়া ও রাধিকা নামক নারী চরিত্রটি এর পাশাপাশি যে সকাল থেকে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাগল দুটো বাঁদর ও গোটা কতক সাপ নিয়ে খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করে। এছাড়াও বেদিয়াদের অনেকেই অন্য পেশার সাথেও যুক্ত ছিল, যেমন রাধিকার প্রথম স্বামী শিবপদ বেতের জিনিস বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। গল্পে উল্লিখিত এই অংশটি থেকে বোঝা যায় বেদিয়া সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ উভয়েই কর্মঠ হয় এবং দুজনেই উপার্জন করে। গল্পে বেদিয়া জনজাতির জীবিকা - জীবনাচরণের রূপ তুলে ধরা হয়েছে।

বেদিয়া জাতির সম্পর্কিত আরও অনেক কিছু তথ্য লেখক গল্পাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। গল্পে বর্ণিত বেদিয়া জাতির মজ্জাগত স্বভাব হিসাবে চিহ্নিত লুকিয়ে চোলাই মদ বানানো এবং জেলে যাওয়া। তারা কখনও মদ কিনে খায় না। এছাড়া ও বেদেরা যে সর্প বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ সাপ নিয়েই মূলত তাদের কারবার এবং এদের জীবনযাপনে সাপ

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে তা সর্বজন বিদিত। সাপে তাদের ভয়ডর খুব একটা নেই। সাপ নিয়ে খেলা দেখানো এদের জীবিকা। এছাড়া ও তারাশঙ্করের বেদিয়াদের সম্পর্কে গল্পে তাদের ধর্মীয় ভাবনা, আচার আচরণ সম্পর্কিত নানান তথ্য 'বেদেনি' গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। বেদিয়া জাতির মানুষেরা ধর্মে ইসলাম আবার তাদের ধর্মীয় আচার আচরণ হিন্দুদের ন্যায়। তারা মনসা পুজো করে, মঙ্গলচন্ডী, ষষ্ঠীর ব্রত করে আবার মা কালি, দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। এক মিশ্র রীতি এবং দ্বিবিধ ধর্মমতের অদ্ভুত মেলবন্ধন ও সংস্কারের প্রচলন পাওয়া যায় এই জাতির মধ্যে। এরা ধর্মে ইসলাম হলেও সন্তানের নাম রাখে হিন্দু দেব দেবীর নামানুসারে - শম্ভু, রাধিকা, কৃষ্ণ, হরি,কালী। হিন্দু পুরাণ - প্রচলিত নানা কাহিনী এদের কণ্ঠস্থ। এদের জাতি জিজ্ঞাসা করলে নিজেদের 'বেদে' বলে পরিচয় দেয়। আবার এই বেদেদের অন্য এক দল নিজেদের পটুয়া বলে, যারা নিজেরাই আঁকে ও হিন্দু পৌরাণিক গান গায়। এই বিশেষ আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষগুলোর বিবাহ কিন্তু কেবল এদের বেদিয়া জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এরা কখনই নিজেদের জাতির বাইরে গিয়ে বিবাহ করে না বা ইসলাম ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় না। লেখক গল্পে বেদিয়াদের সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন —

> "শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল, আরও একটু দূরে তার একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কিষ্টো। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করলে বলে, বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসা পুজো করে, মঙ্গল চন্ডী, ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালি দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি কালি দূর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু পুরান কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। নই একটি সম্প্রদায় পট দেখিয়া হিন্দু পৌরাণিক গান করে, তাহারা নিজেদের পটুয়া, পট তাহারা নিজেরাই আঁকে। বিবাহ আদানপ্রদান সমগ্র ভাবে ইসলাম ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামীয় পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না কবর দেয়। জীবিকায় বাজিকর, সাপধরে সাপ নাচাইয়া গান করে বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়, অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ লইয়া খেলা দেখায়।"[২]

এসবের পাশাপাশি বেদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা ভোজবিদ্যা, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং নৃত্য-গীতে ও পারদর্শিতার উদাহরন গল্পে স্পষ্ট। এদের নৃত্য-গীত এবং পোশাকের ধরন একেবারে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র। 'বেদেনী' গল্পে আদিবাসী গোষ্ঠীর বেদিয়া জাতির ধর্মীয় আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, তাদের জীবিকা, তাদের জীবনযাপনের নানান চিত্র সুনিপুণভাবে চিত্রিত।

তারাশাঙ্করের 'যাদুকরী' গল্পে 'বাজীকর' জাতির কাথা পাওয়া যায়। গল্পে লেখক বলেন এরা বেদে নয় কিন্তু বেদেদের সাথে এদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আবার আমরা যদি লক্ষ্য করি বেদিয়াদের নৃতাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্ঘাটনে বেদিয়াদের সাতটি যে ভাগ বা শাখা পাওয়া যায় সেখানে বাজীকর একটি বেদিয়াদের শাখা। নৃতাত্ত্বিক ডালটন সাহেব বাজীকরদের বেদিয়া জনজাতির শাখা হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। এই গল্পটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বেদিয়াদের সাথে বাজীকরদের জাতিগত কোনো তফাৎ সেভাবে নেই। 'বেদেনী' গল্পেও বাজীকরদের লেখক বেদিয়া বলেই উল্লেখ করেছেন। যাদুকরী গল্পে দেখা যায় এই বাজীকর জাতির পেশা ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করা, ধর্ম তাদের হিন্দু। কিন্তু তাদের যে আচার, রীতিনীতি, কোনটাই হিন্দুধর্মের পঞ্জিকার সাথে, জাতিকুলের সাথে যায়না। তাদের মুখে এক অদ্ভুত মিষ্টি টানের ভাষা, যা দিয়ে তাদের স্বতন্ত্রতা চিহ্নিত করা যায়। তাদের পরনে তারা সৌখিন শাড়ি পরে, হাতে কাঁচের অথবা গিলটির চুড়ি পরে, গলায় গিলটির মালা, হাতে বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরত মাকড়ি কিন্তু বর্তমানে পরে ঝুমকা। তাদের কাছে ঝুলিতে থাকে সাপ, ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র। এদের মেয়েরা পুরুষদের থেকে অনেক স্বতন্ত্র হয়। এই বাজীকর জাতের যে গান,নাচ ও সুর একান্তই তাদের নিজস্ব যা বাজীকর মেয়ে ছাড়া অন্য কেউ পারেনা। এরা যাযাবর শ্রেনি ও এদের বসতি মূলত রাঢ়বঙ্গে। গল্পে লেখক এদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'নারী ও নাগিনী' গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায়, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪১ এ প্রকাশিত। গল্পে খোঁড়া শেখ সাপের ওঝা। ধর্মীয় ভাবে সে মুসলিম কিন্তু সে তার পোষা সাপ বিবিকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে বলে

তাদের 'নিকা' হয়েছে ও নাকছাবি পরিয়ে দেয়। সিঁদুর দিয়ে বিবাহরীতি হিন্দু বিবাহরীতিতে বর্তমান। এই গল্পেও হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত মিশ্র দ্বিবিধ রীতির চিত্র পরিস্ফুট। পাশাপাশি সাপের সাথে মানুষের সখ্যতার, আত্মার টান অনুভবের কথা ফুটে ওঠে গল্পে। এছাড়া খোঁড়া শেখের গলায় হিন্দু পৌরাণিক দেব দেবীর গান পাওয়া যায় -

"জানি না গো এমন যে হবে
গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরাতে যাবে
ও জানি না গো"[৩]

গল্পে খোঁড়া শেখ যে বেদিয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ না থাকলেও গল্পটি বিশ্লেষণ ও গল্পটির চরিত্রদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জীবিকা, সংস্কার বিশ্লেষণে বোঝাই যায় খোঁড়া শেখ বেদিয়া জাতির মানুষ।বেদিয়াদের সাথে সাপের সম্পর্ক ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত, তা এই গল্পে স্পষ্ট। এছাড়াও এই ব্রাত্য, অন্ত্যজ মানুষগুলোর মধ্যে বিচিত্র সামাজিক আচার-বিশ্বাসের পরিচয় এই গল্পে আছে। জোবেদাকে সাপে কামড়ালে দেখা যায় সাপে কাটা রোগীর মৃত্যু লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মাথার চুল উঠে আসার মতো ঘটনা যা সম্পূর্ণ যুক্তির বাইরে। যুক্তি বুদ্ধিহীন এই সমস্ত আচার বিশ্বাসে বিশ্বাসী এই মানুষগুলোর ভাবনার স্বরূপের কিছু চিত্র গল্পে চিত্রিত।

তারাশঙ্করের 'সাপুড়ের গল্প' গল্পটিতে লেখক সাপ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ অনেক শ্রেণীর মানুষ করলেও, যারা 'খাস সাপুড়ে জাতের' অর্থাৎ বেদিয়া জাতি সম্পর্কিত কয়েকটি কথা বলেন —

> "খাঁটি এবং খাস সাপুড়ে জাতের যারা তাদের তো আর কথাই নাই। খাল - বিলের কাছে পতিত প্রান্তরে সেই অরণ্যযুগের ঘর - দুয়ারে বাস করে; খাওয়া - দাওয়া, আচার - আচরণ, নাচ - গান, ভিতর - বাহির দেহ মনও তাই - সেই আদিম এবং অরণ্য। চেহারায় পর্যন্ত সেই ছাপ।"[৪]

আদিমতায় পূর্ণ, আরণ্যক জীবন বেদিয়া জনজাতির মানুষদের গল্পে তা স্পষ্ট। তাদের দৈহিক জাতিগত রূপ বর্ণনাও এরূপ –

> "দেহের মিশমিশে কালো রঙে, করকরে ঘন চুলে, নাক মুখ চোখের গড়নে সে সত্য দিনের আলোয় কালো কালো সাপের মতো স্পষ্ট।"[৫]

বেদিয়ারা ডেরা বাঁধে আমবাগানে, নয় বটতলায় মূলত গৃহস্থ বাড়ি থেকে দূরে। তারা গ্রামে ভিক্ষা করে, সাপের খেলা দেখিয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করে পয়সা উপার্জন করে। নারী ও পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে লেখক সর্বদাই বেদিয়া নারীদের রহস্যময়ী, বিশেষ আশ্চর্য রূপে দেখিয়েছেন। বেদিয়া নারীদের রূপে থাকে এক অমোঘ রহস্য ও আকর্ষণীয়তা। তারা স্বেচ্ছাচারি, প্রতিশোধ স্পৃহাপূর্ণ, কামনা-বাসনায় ভরপুর ও সাহসী আদিমতায় পূর্ণ এক মানবচরিত্র। বেদিয়া নারীরা তাদের আদিম যাযাবর জীবনের গতিময়তার সাথে তাল মিলিয়ে সময়ের সাথে সাথে পুরুষ সঙ্গী বদল করে। বেদিয়া রমণীরা তিন চারবার বিয়ে করে। এ থেকে বোঝা যায় বেদিয়া জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রথার চল আছে। বেদিয়া জাতির মেয়েরা 'মোহিনী' জানে অর্থাৎ তারা যাদুমন্ত্র বা মানুষকে বশ করার ক্ষমতা রাখে- এই কথা লোকমুখে প্রচলিত লোক বিশ্বাস, যা লেখকের বেদিয়া জাতি নিয়ে লেখা প্রায় প্রতিটা গল্পেই সুস্পষ্ট রূপে চিত্রিত।

এই বেদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা বা এই সাপুড়ের দল মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্ধমান- বিভিন্ন জায়গায় যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়। এছাড়া গল্পে এর কিছু আচার-বিশ্বাস বা কুসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়—

> "শুশুনিয়া পাহাড় ওদের না জানার জায়গা নয়। এখানে ওরা সাবধান। 'ভোরবেলার আগে কেউ বাহিরিবি না। দিদিমণি চাকিতে থাকতি থাকতি ডেরায় ফিরবা। সিঁধেলচোর লয়রে মানিক, ডাকাত আছে ওৎ পেত্যা'। মানে সাপ নয় বাঘ। সাপ সিঁধেলচোর, বাঘা ডাকাত। 'আঁধার নামলে বন থেকে লাল গামছা মাথায় বেঁধ্যা পথের ধারে বস্যা হাই তুলবে, লম্বা জিভ বার করযা আপন মুখ চাটবে'। শিয়াল ডাকিলে পরে বেদেরা লিবে না ঘরে।"[৬]

এই বেদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা সাপের বিষ খেয়ে নেশা করে। এই গল্পে বেদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের বাসস্থান, জাতিগত রূপ বৈশিষ্ট্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের জীবিকা, আর্থসামাজিক অবস্থান চিত্র সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদের মেয়ে' গল্পে বেদিয়াদের মেয়ে শিবির নারীচরিত্রের রূপ, ভালোবাসা যেমন প্রকাশিত অন্যদিকে গল্পে বেদিয়া জাতির জীবনচর্যার কিছু রূপও স্পষ্ট। বেদিয়া জাতি যাযাবর একথা তাদের জাতিগত সত্য বৈশিষ্ট্য হলেও গল্পে তারা তিন পুরুষ ধরে এক গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। হিন্দু বাঙালিদের সংস্পর্শে, গ্রামের লোকালয়ে বসবাস করায় শিবির পূর্বপুরুষরা ও জাতিগোষ্ঠীর লোকজন —

> "তিন পুরুষ হয়ে গেছে বেদেদের বেশভূষা, রীতি, ভাষা সব ভুলে গেছে।"[৭]

এছাড়া ও গল্পে দেখি বেদিয়া জনজাতির অভ্যাসের ধর্ম চুরি করা এবং সেই জেলখাটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তারা বাঙালির সংস্পর্শে বাঙালি হয়ে উঠেছে যেন। কিন্তু তাদের কিছু জাতিগত বৈশিষ্ট্য যা একান্তই তাদের নিজস্ব স্বধর্ম, তার কিছু রূপ অবশ্যই বর্তমান। এই স্বধর্ম, তাদের স্বরূপ ই তাদের আলাদা একটা জাতিরূপে চিহ্নিত করে। বেদিয়া রমণীরা সাধারণ অন্য জাতির নারীদের থেকে স্বভাবে আচরণে এবং রূপ ও গুণগত বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র ও বিচিত্র চরিত্রের হয় তা তারাশঙ্করের বেদিয়া কেন্দ্রিক গল্পে স্পষ্ট। বেদিয়া রমণী রা হিংস্র, স্বৈরিণী, সাহসী চরিত্রের হয়। কখনও তারা শান্ত কখনও উগ্র এবং কামনা বাসনায় ভরপুর। গল্পে দেখি এই বেদিয়া রমনীরা দেহ ব্যবসা করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। বেদিয়া রমণীদের এক অদ্ভুত রূপ লাবণ্য থাকে তাদের বয়স হলেও যেন বয়সের ছাপ তাদের মুখে পড়ে না তাদের। তারা যে অত্যন্ত হিংস্র, সাহসী হয় তা প্রায় সব গল্পেই স্পষ্ট –

> "ডালা খোলা ঝাঁপির ভিতরের সাপের ফণা তুলে ছোবল মারার মতো শিবি লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ছোবল মারার মতো ছুরিখানা বসিয়ে দিলে।"[৮]

এই গল্পেও লেখক বেদিয়া জনজাতির যাযাবর জীবনের বদলে তাদের স্থায়ী বসবাসের কথা বললেও বেদিয়াদের জাতিগত আদিমতার যে বৈশিষ্ট্য তার আভাস একই আছে। বাঙালিদের সংস্পর্শে থেকে তাদের বেশভূষা, ভাষা, কিছু রীতিনীতি বদলালেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জাতিগত আদিম বৈশিষ্ট্য স্বমহিমায় বিরাজিত। একটা জাতির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য তাকে স্বতন্ত্র করে, সেই স্বতন্ত্রতা এখানে বিদ্যমান।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পে দেখা যায় এক বেদে মেয়ে বা বেদিনী সে বলে কবিরাজরা সাপের বিষ থেকে ওষুধ বানিয়ে সাপে কামড়ানো রোগীকে বাঁচায়। এই গল্পে ও তাদের যাযাবর জীবনযাত্রার কথা পাওয়া যায়, 'এই বছরের পেরথমে বার হলাম, ফিরব সেই আশ্বিন মাসে'।[৯] এছাড়াও বেদিয়া মেয়েরা যে মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক জানে সেই চিত্র গল্পে পরিস্ফুট। 'মিতালির খেলা' নামক একরকম খেলার কথা, কাঁউরের বিদ্যা, বাণমারা এই সমস্ত বেদিয়া জনজাতির মানুষের মধ্যেও প্রচলিত। তবে এই আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরা সমাজের অন্য স্তরের মানুষের চোখে যে বেশ নিম্ন স্তরে বসবাসকারী মানুষ এবং তাদের পেশাগত দিক নিরূপণ করলে তারা যে হতদরিদ্র একথা নিশ্চিত রূপে বলা যায়।এর পাশাপাশি গল্পে উচ্চবিত্ত তথাকথিত সভ্যমানুষ দ্বারা তারা অত্যাচারিত, শোষিত-লাঞ্ছিত, সেই চিত্রও ফুটে ওঠে। তাদের সামাজিক অবস্থানের স্বরূপ স্পষ্ট।

১৩৬০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বরমলাগের মাঠ' ছোটগল্পটিতে হিন্দু নিম্ন বর্গীয় বাউরি জাতির কথা থাকলেও এই বাউরি বা সমাজের অন্ত্যজস্তরের মানুষদের বেদেদের প্রতি মনোভাব ও ধ্যানধারনার প্রকাশ পাওয়া যায়। এই গল্পেও বেদিয়া নারীরা যে মন্ত্রতন্ত্রে পারদর্শী একথা স্পষ্ট —

> "এক বেদের মেয়ের সঙ্গে জোয়ান বয়সে হয়েছিল ভালোবাসা। সেই দিয়েছিল তাকে কাঁউরের বিদ্যে।"[১০]

বেদিনী লালমনি 'কাউরের ডাকিনীর মন্তর' জানত এবং নটবর যদি লালমনিকে পরিত্যাগ করে তাহলে তাকে বানমেরে কি সাপ ছেড়ে লালমনি প্রাণে মেরে ফেলত। এই গল্পে বেদিয়া রমনীর প্রতিশোধস্পৃহা মনস্ক, হিংস্র, যাদুবিদ্যায় পারদর্শী এবং সমাজের অন্য স্তরের মানুষদের বেদিয়া জাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির রূপ সুস্পষ্ট। তারাশঙ্করের প্রায় প্রতিটা গল্পেই বেদিয়া নারীদের মধ্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণ, তাদের স্বৈরিণীচরিত্র, আক্রমনাত্মক মনোভাব প্রস্ফুটিত। সাধারন হয়েও তারা অসাধারন।

আলোচিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেদিয়া জনজাতিকেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলি পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতের আদিম জনগোষ্ঠীর অন্যতম এক জনগোষ্ঠী বেদিয়া জনজীবনের বিচিত্র জীবনধারা, তাদের আর্থসামাজিক

অবস্থান, নিজস্ব ধর্ম – সংস্কার – সংস্কৃতি – লোকাচার – বাসস্থান - জাতিগত রূপ বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। তারাশঙ্করের গল্পগুলি কেবল গল্প নয় এগুলো একটা জাতির ইতিহাস বলা যেতে পারে ও বহুল তথ্যসমৃদ্ধ, যা একান্তই লেখকের প্রত্যক্ষদর্শীতার ও জীবন দর্শনের ফসল। গল্পগুলিতে প্রত্নতত্ত্বের (archaeology) উপাদান বিরাজমান। প্রত্নতত্ত্বে প্রাচীন উপাদান, অতীতের সংস্কৃতি ও পরিবেশগত তথ্য চর্চার মাধ্যমে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রণালী বিশ্লেষণ করার চেষ্টা প্রত্নতাত্ত্বিকরা করে থাকেন। তারাশঙ্করের আদিম জনগোষ্ঠী বেদিয়া জনজাতিকেন্দ্রিক তথ্য নির্ভর গল্পগুলি প্রত্নঅধ্যয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

তৎকালীন সময়ে তারাশঙ্কর ব্যাতিত দ্বিতীয় আর কোনো সাহিত্যিকদের লেখায় বেদিয়া জনজাতির জীবনচর্যার এত নিবিড় রূপ পাওয়া যায় না। গল্পের মাধ্যমে লেখক একটি জাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে তা সংরক্ষিত করেছেন। লেখকের নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফসল বেদিয়া জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলি। একটি জাতির নিজস্ব পরিচয়, গৌরব তৈরি হয় তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বজাতির রূপ ও গুণ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধে আলোচিত গল্পগুলি বেদিয়া জনজাতির জীবনচর্যার ইতিহাস, জাতির পরিচয় নির্মাণ ও বহনের নিদর্শন এবং এর গুরুত্ব বাংলা সাহিত্যে অমূল্য।

## Reference :

১. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৩৫
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭
৩. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (প্রথম খন্ড), সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৭০
৪. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৬০
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৩
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

## Bibliography :

**আকরগ্রন্থ :**

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (প্রথম খন্ড), সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল, ২০১৯ (চতুর্দশ মুদ্রণ), কলকাতা- ৭০০০০৯।

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, মে, ২০১৯ (পঞ্চদশ মুদ্রণ), কলকাতা- ৭০০০০৯।

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল, ২০১৯( ত্রয়োদশ মুদ্রণ), কলকাতা- ৭০০০০৯।

**সহায়ক গ্রন্থ :**

ঘোষ, প্রদ্যোত, বাংলার জনজাতি (প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপনী, জানুয়ারি ২০০৭, কলকাতা- ৭০০ ০০৯।